বাছুর পালন

বাছুর লালন পালনের গুরুত্ব

বাছুর উন্নয়নকে সাধারণত পালের উন্নয়নের পূর্বশর্ত হিসাবে বিবেচনা করা হয়। কারণ আজকের বাছুর আগামী দিনের ভবিষ্যৎ। বাছুর লালন-পালন যদি যথাযথভাবে না করা হয় তবে ভবিষ্যৎ উৎপাদন হ্রাস পাবে। একটা নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত গাভীর উৎপাদন ক্ষমতা বজায় থাকে। পর্যায়ক্রমে উন্নত জাত এবং উৎপাদনশীল গাভী দ্বারা কম উৎপাদনশীল গাভীকে অপসারণের মাধ্যমেই উচ্চ উৎপাদনশীল পাল গঠন করা সম্ভব। তাই বাছুর লালন-পালন অবশ্যই গুরুত্বপূর্ণ।

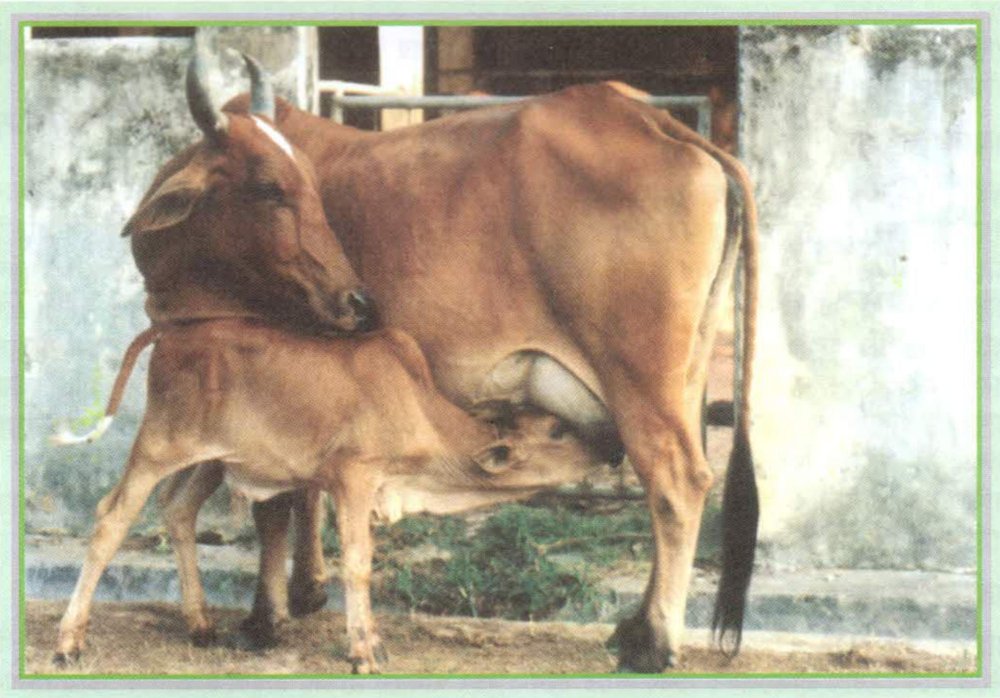

বাছুরের গর্ভকালীন যত্ন

বাছুরের গর্ভকালীন যত্ন বলতে প্রধানত মায়ের যত্নই বুঝায়। এক্ষেত্রে গর্ভবতী গাভীকে অন্তত গর্ভের শেষ তিনমাস পর্যাপ্ত পুষ্টি সরবরাহ করতে হবে। দুধ দোহানো হলে ধীরে ধীরে শেষ তিন মাসে শুকিয়ে ফেলতে হবে। গাভীকে পর্যাপ্ত বিশ্রাম এবং পরিচ্ছন্ন পরিবেশে রাখতে হবে। অন্য গরুর সাথে যেন মারামারি না করে তা খেয়াল রাখতে হবে। প্রসব নিকটবর্তী হলে মেটারনিটি পেন বা আলাদা স্থানে রাখতে হবে।

জন্মের প্রাক্কালে যত্ন

অবশ্যই আলাদা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ও শুকনো জায়গাতে রাখতে হবে। অপরিষ্কার স্যাঁতস্যাঁতে জায়গাতে বাছুর প্রসব করলে বাছুরের বিভিন্ন প্রকার রোগ দেখা দিতে পারে। স্বাভাবিক প্রসবের লক্ষণ ব্যতীত অস্বাভাবিক লক্ষণ প্রকাশ পেলে পশু চিকিৎসকের পরামর্শ গ্রহণ করা কর্তব্য। এ সময় শুকনো খড় বিছিয়ে দিয়ে পাশে পর্যাপ্ত খাওয়ার পানির ব্যবস্থা করতে হবে।

জন্মের পর বাছুরের যত্ন

জন্মের পর পরই বাছুরকে শুকনো খড়কুটো বা ছালার উপর রাখতে হবে। বাছুরের নাক ও মুখমন্ডল হতে লালা বা ঝিল্লি (Mucous) পরিষ্কার করতে হবে। নতুবা শ্বাসরুদ্ধ হয়ে মারা যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। যদি বাছুরের শ্বাস-প্রশ্বাস নিতে কষ্ট হয় তবে বুকের পাঁজরের হাড়ে আস্তে আস্তে কিছুক্ষণ পর পর কয়েক বার চাপ প্রয়োগ করতে হবে। বাছুরের নাকে, মুখে, নাভীতে ফুঁ দিলেও ভাল ফল পাওয়া যায়। প্রয়োজনে শ্বাস-প্রশ্বাস বর্ধনকারী ঔষধ ব্যবহার করা যেতে পারে। জন্মের সাথে সাথে বাছুরের নাভীবোটে নাভীতে কিছু এন্টিসেপটিক যেমন টিংচার আয়োডিন, ডেটল বা সেভলন লাগাতে হবে। ফলে ধনুষ্টংকার, নাভী ফুলা, ইত্যাদি হবার সম্ভাবনা থাকে না। গাভী যেন তার বাছুরকে চাটতে (লেহন) পারে সে সুযোগ দিতে হবে অথবা শুকনো খড় বা ছেঁড়া কাপড় দিয়ে শরীর মুছে দিতে হবে। এ অবস্থায় বাছুরকে পানি দিয়ে ধৌত করা সমীচীন হবে না। কারণ পানির সংস্পর্শে আসলে বাছুরের ঠান্ডা লেগে যেতে পারে এবং নানা ধরনের রোগের উপসর্গ দেখা দিতে পারে। বাছুর উঠে দাঁড়ালে শালদুধ খাওয়াতে হবে।

বাছুরের বাসস্থান

বাছুরের জন্য উপযুক্ত বাসস্থান প্রয়োজন। স্বাস্থ্যসম্মত বাসস্থান বাছুরকে রোগমুক্ত রাখার প্রধান সহায়ক। বাছুরকে রোগমুক্তরাখার জন্য তাদেরকে পৃথক প্রকোষ্ঠে রাখতে হবে এবং এর ফলে প্রতিটি বাছুরের রক্ষণাবেক্ষণ সহজতর হয়। অনেক বাছুর একসাথে থাকলে দূর্বল বাছুরগুলো সবল বাছুরদের সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে প্রয়োজনমাফিক খাবার খেতে পারে না এবং আরও দুর্বল হয়ে পড়ে। বাছুরের ঘর ঢালু এবং শুকনো ও পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হওয়া উচিত। বাসস্থানে আলো বাতাস সরাসরি প্রবেশের ব্যবস্থা থাকা উচিত। গ্রীষ্মকালে প্রচন্ড গরম ও শীতকালে প্রচন্ড ঠান্ডা দ্বারা বাছুরগুলো যাতে ক্ষতিগ্রস্থ না হয় সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে। ঘরের মেঝেতে শুকনো খড় বা ছালার চট বিছিয়ে দিতে হবে। প্রতিটি বাছুরের জন্য ৬ ইঞ্চি x ৪ ইঞ্চি মাপের ঘরের প্রয়োজন। গ্রামীণ পর্যায়ে বাঁশ ও কাঠের সাহায্যে অতি সহজেই ঘর নির্মাণ করা সম্ভব। ঘরে খাদ্য ও পরিষ্কার পানি সরবরাহ করার জন্য পাত্র রাখতে হবে।

বাছুরের অন্যান্য যত্ন

বাছুরের প্রতি সর্বদাই সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে। সময়মত খাদ্য ও পানি সরবরাহের প্রতি সতর্ক দৃষ্টি দিতে হবে। রোগ প্রতিরোধক টিকা দিতে হবে। বৃহৎ খামারে প্রতিটি বাছুরকে আলাদা করে চেনার জন্য প্রয়োজনীয় নম্বর দিতে হবে। বাছুর বড় হওয়ার সাথে সাথে শিং কেটে ফেলাই উত্তম। না হলে বিভিন্ন ধরনের দুর্ঘটনা ঘটতে পারে।

বাছুরের খাদ্য

বয়স ভেদে বাছুরের খাদ্য তিন ধরনের হতে পারে।

জন্মের পর থেকে সাত দিন

এ সময় বাছুর প্রয়োজনমত কলোস্ট্রম, কাঁচি দুধ বা শালদুধ খাবে। অন্য কোনো খাবার না দিলেও চলবে।

এক সপ্তাহ বয়স হতে দুধ ছাড়ানো পর্যন্ত (৫-৬ মাস বয়স)

এ সময় বাছুরকে দুধের সাথে কাফ স্টার্টার দেয়া উচিত। দুধ খেলে ভিটামিন না দিলেও চলবে। কাফ স্টার্টার না দিলে বাছুরকে পরিমাণমত উন্নতমানের আঁশ জাতীয় খাবার সরবরাহ করতে হবে। কাফ স্টার্টারে নিম্নলিখিত পুষ্টি উপাদানসমূহ থাকতে হবে।

সারণি ১ ঃ কাফ স্টার্টারের পুষ্টি উপাদান

পুষ্টি উপাদান	পরিমাণ (%)
আমিষ	১৬-১৮
আঁশ জাতীয় খাবার	৭-১০
ক্যালসিয়াম	০.৬-০.৭
ফসফরাস	০৪-০.৫
ম্যাগনেসিয়াম	০.১৫-০.২০
সোডিয়াম	০.০৭-০.০৮

দুধ ছাড়ানোর পরবর্তীকাল

ট্রানজিশন পিরিয়ড বা খাদ্যাভ্যাস পরিবর্তন সময়ের মাঝামাঝি হতে বাছুরকে ক্রমে আঁশ জাতীয় খাদ্যের ওপর নির্ভরশীল হতে রপ্ত করতে হবে যাতে দুধ ছাড়ানোর পর বাছুর পুরোপুরি আঁশ জাতীয় খাদ্য নির্ভর হতে পারে। এ সময় আশঁ জাতীয় খাদ্যের সাথে নির্দিষ্ট পরিমাণ দানাদার খাদ্যের মিশ্রণও সরবরাহ করতে হবে। বাছুরের এ সময়ের রসদ বাড়ন্ত গরুর অনুরূপ হবে।

বাছুরকে খাওয়ানোর পদ্ধতি

বাছুর জন্মের পরপরই বাছুরের ব্যবস্থাপনা এবং খাবার প্রণালী নিম্নরূপ হবে ঃ

১. গাভীর গর্ভধারণের ২৭৪-২৯০ দিন (গড়ে ২৮৩) দিনের মধ্যে বাছুরের জন্ম আশা করা যায়,

২. বাছুরের জন্মের পরপরই ফিটাল মেমব্রেন ও শ্লেষ্মা নাক মুখ থেকে সরিয়ে নেয়া উচিত,

৩. জন্মের পরপরই বাছুরকে মায়ের শালদুধ (কলোস্ট্রাম) খাওয়াতে হবে।

শালদুধ খাওয়ানোর নিয়ম হলো, দৈনিক প্রতি ১০০ কেজি ওজনের জন্য ১০ কেজি অর্থাৎ ২০-২৫ কেজি ওজনের বাছুরের জন্য দৈনিক ১.২-১.৫ কেজি শালদুধ খাওয়াতে হবে। অবশ্যই আধ ঘন্টা থেকে ১ ঘন্টার মধ্যে এই দুধ খাওয়ানো শুরু করা উচিত। এই দুধ খাওয়ালে বাছুরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়।

বাছুরকে প্রথম দিন উপরোক্ত নিয়মে খাওয়ানোর পর পরবর্তী প্রায় তিন মাস পর্যন্ত নিম্নের ছকে বর্ণিত খাবারপদ্ধতি অনুসরণ করা যেতে পারে।

সারণি ২ ঃ জন্মের পর হতে তিন মাস বয়স পর্যন্ত বাছুরকে খাওয়ানোর নিয়ম

বয়স (সপ্তাহ)	প্রতি ১০০ কেজি ওজনের জন্য দুধ	প্রতি ১০০ কেজি ওজনের জন্য দানাদার	কচি ঘাস/ইউএমএস
১-২	১০	সামান্য পরিমাণ	সামান্য পরিমাণ
৩-৪	৮	০.৫	সামান্য পরিমাণ
৫-৬	৬	১.০	প্রচুর পরিমাণ
৭-৮	৪	১.৫	প্রচুর পরিমাণ
৯-১০	২	২.০	প্রচুর পরিমাণ
১১-১২	০	২.৫	প্রচুর পরিমাণ

দুধ খাওয়ানো

সাধারণত প্রতি ১০০ কেজি ওজনের জন্য ৮ কেজি পরিমাণ দুধ খাওয়ানো উচিত। অর্থাৎ ৪০ কেজি ওজনের বাছুরের জন্য প্রায় ৩-৩.৫ কেজি দুধ খাওয়ানো উচিত। উপর্যুক্ত নিয়মানুসারে প্রায় তিন মাসের মধ্যে বাছুরকে দুধ ছাড়ানো যায়। এরপরও দুধ খাওয়ালে কোনো অসুবিধা নেই। তবে এ সময় বেশি দুধ খাওয়ানোতে আর্থিক অপচয় হয়। আমাদের দেশে বাছুরকে মোটামুটি ৬ মাস থেকে ১ বছরের মধ্যে দুধ ছাড়ানো হয়।

বাছুরের দানাদার খাদ্য

এই দানাদার মিশ্রণ কম আঁশ যুক্ত এবং উচ্চ প্রোটিন ও উচ্চ শক্তি সম্পন্ন হতে হয়। দানাদার খাদ্যের দুটি ফরমুলা নিচে দেয়া হলো।

সারণি ৩ ঃ বাছুরের জন্য কাফ স্টার্টার (% হিসাবে)

উপাদান	১ নং	২ নং
গমের ভুসি	২৫	-
গম/চাল ভাংগা	২০	২০
মাষকলাই/খেসারি ভাংগা	২৫	২৫
তিলের খৈল	১৫	-
নারিকেলের খৈল	-	১৫
ঢেঁকিছাটা চালের কুঁড়া	-	২৫
শুঁটকি মাছের গুঁড়া	৭	৭
চিটাগুড়	৫	৫
লবণ	১.৫	১
ঝিনুক/হাড়ের গুঁড়া	১	১.৫
ভিটামিন মিনারেল প্রিমিক্স	০.৫	০.৫
	১০০	১০০

কচি ঘাস অথবা ইউ এম এস

ছোট বাছুরকে কচি ঘাস, ডালজাতীয় ঘাস ইত্যাদি খাওয়ানো যেতে পারে। তবে অভ্যাস করলে ইউরিয়া মোলাসেস খড় বা ইউরিয়া প্রক্রিয়াজাতকৃত খড় খাওয়ানো যেতে পারে। দৈহিক ওজনের ১.৫% হারে পূর্বে উল্লেখিত দানাদার খাবারের সাথে পর্যাপ্ত পরিমাণ ঘাস বা খড় খাওয়ালে মোটামুটি ভাল ফল আশা করা যায়।

বাড়ন্ত গরুকে খাওয়ানোর পদ্ধতি

বাছুরের বয়স মোটামুটি ৬ মাস বয়সের পর থেকে বয়ঃপ্রাপ্ত হওয়া পর্যন্ত তাদের ওজনের ১% হারে দানাদার খাবারের সাথে ইউ এম এস বা সাইলেজ বা সবুজ ঘাস বা ইউরিয়া সংরক্ষিত খড় খাওয়ালে ভাল দৈহিক ওজন বৃদ্ধি আশা করা যায়।

সারণি ৪ ঃ বাড়ন্ত, বয়স্ক গরুর জন্য সম্ভাব্য দানাদার খাদ্য মিশ্রণ (গ্রাম)

উপাদান	মিশ্রণ-১	মিশ্রণ-২	মিশ্রণ-৩	মিশ্রণ-৪	মিশ্রণ-৫
চালের খুদ	-	২০০	-	২০০	১০০
গম ভাংগা	-	-	১৫০	-	-
খেসারি ভাংগা	-	-	-	-	২৫০
গমের ভুসি	৫৪০	৩০০	২৫০	১৫০	১৫০
চালের কুড়া	-	২৫০	৩০০	২০০	২৫০
শুঁটকি মাছের গুঁড়া	৮-	৫০	৫০	৫০	৫০
লবণ	৫	৫	৫	৫	৫
ঝিনুকের গুঁড়া	৫	৫	৫	৫	৫
মোট	১০০০	১০০০	১০০০	১০০০	১০০০
পুষ্টিমান এম ই (মেগাজুল প্রতি কেজি)	১০.৭১	১১.২৬	১০.৮৮	১১.০৪	১১.০৬
প্রোটিন (গ্রাম/কেজি)	২০৭	১৮৭	১৮৩	১৮১	১৮৪
দাম (টাকা/কেজি)	৭.৮৫	৭.৫৫	৭.৭৪	৭.৭০	৭.৭৭

বি এল আর আই- এর এক গবেষণায় দেখা গেছে, ইউ এম এস বা ইউরিয়া সংরক্ষিত খড়ের সাথে ১.৫ কেজি গমের ভুসি এবং ১০০ গ্রাম শুটকি মাছের গুঁড়া ব্যবহার করে গরুর দৈনিক প্রায় ৭০০ গ্রাম ওজন বৃদ্ধি পেয়েছে। এ সময়ে গরুকে খাওয়ানোর জন্য যে বিভিন্ন প্রকার দানাদার মিশ্রণ হতে পারে তার একটি তালিকা নিচে দেয়া হলো (এক কেজি মিশ্রণের পরিমাণ)। তাছাড়া গরুকে খাওয়ানোর জন্য যে বিভিন্ন প্রকার আঁশ জাতীয় খাবার খাওয়ানো যেতে পারে তা হলো ইউরিয়া-মোলাসেস খড় (ইউ এম এস), ইউরিয়া সংরক্ষিত খড় এবং কাঁচা ঘাস (যেমন নেপিয়ার, পারা, ভুট্টা, ওট, সরগম এবং ডাল জাতীয় ঘাস, খেসারি, মাষকলাই, ইপিল ইপিল ইত্যাদি)। এই ঘাস খড়ের সাথে মিশিয়ে বা সাধারণ ঘাস ও ডাল জাতীয় ঘাস মিশিয়ে খাওয়ানো যেতে পারে। তাছাড়া কখনই ডাল জাতীয় ঘাসকে এককভাবে খাওয়ানো ঠিক নয়, অন্য ঘাস বা খড়ের সাথে মিশিয়ে খাওয়ানো উচিত।

৫ নং সারণিতে বিভিন্ন ঘাসের মিশ্রণ দেয়া হলো ।

সারণি ৫ ঃ বিভিন্ন ধরনের ঘাসের মিশ্রণ

	উপাদান	শুষ্ক পদার্থের হার শতকরা পরিমাণ	প্রোটিন (%)	বিঃ শক্তি (MJ/কম)
মিশ্রণ-১	পারা	৬৫	১২	৮.৭
	কাউপি	২৫		
	মোলাসেস	১০		
মিশ্রণ-২	নেপিয়ার	৭০	১০	৮.২
	খেসারি	২০		
	মোলাসেস	১০		
মিশ্রণ-৩	ভুট্টা	৮০	১০	৮.৭
	খেসারি	২০		
মিশ্রণ-৪	দেশী ঘাস	৭০	৯	৮.১
	ইপিল ইপিল	২০		
	মোলাসেস	১০		

বাছুরের রোগ ও প্রতিরোধ ব্যবস্থা

বাছুরকে স্বাস্থ্যবান, কার্যক্ষম, উৎপাদনমুখি রাখতে শুধু সুষম খাদ্য সরবরাহই যথেষ্ট নয়, রোগব্যাধি হতে মুক্ত রাখাও একান্ত দরকার । রোগজীবাণু দ্বারা আক্রান্ত হলে বাছুর দুর্বল, স্বাস্থ্যহীন হয়ে পড়ে, ফলে এদের দৈহিক বৃদ্ধি, কার্যক্ষমতা ও উৎপাদন হ্রাস পায় এবং মাঝে মাঝে অকাল মৃত্যুতে মালিকের তথা দেশের গো-সম্পদের ক্ষতি হয়ে থাকে ।

বাছুরের রোগ

বাছুরের রোগ সাধারণত দুই প্রকার । সাধারণ রোগ ঃ যে সব রোগব্যাধি আক্রান্ত পশুতে সীমাবদ্ধ থাকে, সহজে অন্য পশুতে সংক্রামিত হয় না এবং তুলনামূলকভাবে প্রাণীর মৃত্যুর হার কম, তাকে সাধারণ রোগ বলে । যদিও সাধারণ রোগে মৃত্যুর হার কম, কিন্তু আক্রান্ত বাছুরের স্বাস্থ্য নষ্ট হয়, দৈহিক শক্তি ও বৃদ্ধি কমে যায় এবং উৎপাদন হ্রাস পায় । এজন্য সাধারণ রোগকে অবহেলা না করে ত্বরিত চিকিৎসা ব্যবস্থা নেয়া দরকার । আমাদের দেশে বাছুরের সচরাচর যে সব সাধারণ রোগ-বালাই দেখা যায় বা হয়, সেগুলোর প্রাথমিক ব্যবস্থা সম্পর্কে কিছু আলোচনা করা হচ্ছে ঃ

কাটা, পোড়া, ঘা, আঘাত ইত্যাদি

এগুলো জীবাণুঘটিত রোগ না হলেও অবহেলা করা উচিত নয় । এ রোগগুলোর কারণে বাছুরের প্রাথমিক কোনো ক্ষতি না হলেও পরবর্তীকালে অন্যান্য রোগ বা রোগজীবাণুতে সহজে আক্রান্ত হতে পারে । তাছাড়া এ রোগগুলোর ফলে বাছুরের স্বাস্থ্য এবং কার্যক্ষমতা কমে যেতে পারে । তাই এসব সামান্য অসুখকে অবহেলা না করে সময়মত প্রাথমিক ব্যবস্থা গ্রহণ করা দরকার ।

পেট ফাঁপা, বদ হজম ইত্যাদি

খাদ্যনালীতে কিছু আটকে গেলে অথবা কাদা বালি মিশ্রিত খাদ্য খেলে পেট ফাঁপা বা বদ হজম দেখা দিতে পারে। গ্যাসের জন্য পেট অত্যধিক ফুলে যায় ফলে শ্বাস-প্রশ্বাস নিতে কষ্ট হয়। পশু জাবর কাটাও বন্ধ করে দেয় এবং শরীরের তাপ কিছুটা বৃদ্ধি পায় (১০২°-১০৪°)। অসুখ দেখা দেয়ার সাথে সাথে খাদ্য বন্ধ রাখা দরকার এবং এ অবস্থায় পশুকে ঢালু জায়গায় রাখতে হবে যেন তার শ্বাস-প্রশ্বাস নিতে কষ্ট না হয়। প্রাথমিক চিকিৎসা হিসেবে পারগেটিভ বা কারমিনেটিভ মিকচার খাওয়ানের ব্যবস্থা নিলে ভাল হয়। প্রয়োজনবোধে অভিজ্ঞ ডাক্তারের সহায়তায় পেট ফুটো করে গ্যাস বের করে দেয়া যেতে পারে।

উদরাময়, পাতলা পায়খানা ইত্যাদি

অনেক রোগের কারণে পাতলা পায়খানা হয়ে থাকে, তবে অন্ত্রের রোগ এদের মধ্যে অন্যতম। ঘনঘন পাতলা পায়খানার দরুন বাছুরের মুখ শুকিয়ে যায় এবং দুর্বল হয়ে পড়ে। জীবাণুঘটিত পাতলা পায়খানার কারণে আক্রান্ত বাছুর মারাও যেতে পারে। প্রাথমিক চিকিৎসা হিসেবে বাছুরকে সালফার জাতীয় টেবলেট খাওয়ানো যেতে পারে। দুর্বলতার জন্য স্যালাইন বা গ্লুকোজ ইনজেকশন দেয়া যেতে পারে।

কোষ্ঠ্যকাঠিন্য

বিভিন্ন কারণে কোষ্ঠ্যকাঠিন্য দেখা দিতে পারে। কোষ্ঠ্যকাঠিন্য হলে খাদ্যে অরুচি, পেট ফোলাভাব, পেটব্যথা, পায়খানা শক্ত ও পরিমাণে খুব কম ইত্যাদি লক্ষণ দেখা যায়। কোষ্ঠ্যকাঠিন্যে ক্যাস্টর ওয়েল (ভেরেন্তার তৈল) বাওয়েল লিলি (তিষির তৈল) ১/২-২ পাউন্ড খাওয়ালে উপকার পাওয়া যায়। তাছাড়া লবণ, পানিসহ ম্যাগসাল্‌ফ (Magsulf), পানিসহ ম্যাগকারব (Magcurb) বা অন্যান্য পারগেটিভ মিকচার (Purgative) খাওয়ালে ভাল ফল পাওয়া যায়।

সর্দি-কাশি

অত্যধিক ঠান্ডা, বৃষ্টিতে ভেজা, প্রখর রৌদ্রে থাকা, আবহাওয়ার পরিবর্তনহেতু সর্দি-কাশি হতে পারে। তাছাড়া রোগজীবাণুতে আক্রান্ত হলেও সর্দি-কাশি হতে পারে। নাক দিয়ে পানি পড়া, মাঝে মাঝে হাঁচি বা কাশি দেয়া প্রাথমিক লক্ষণ, তবে এর সাথে শরীর ব্যথা ও জ্বর হতে পারে। সর্দি-কাশি দেখা দিলে আক্রান্ত বাছুরটিকে শুকনো আলো-বাতাস পূর্ণ ঘরে রেখে চিকিৎসার ব্যবস্থা নেয়া দরকার। সালফার জাতীয় টেবলেট, সালফাডায়াজিন (Sulphadiazin), ভেসাডিন (Vesadin), ট্রিনামাইড (Trinamide), ইত্যাদি খাওয়ালে উপকার পাওয়া যায়। কুসুম গরম সরিষার তৈল, ক্যামফর বা তারপিন লিনিমেন্ট দুই পাঁজরে মালিশ করা যেতে পারে।

উঁকুন

উঁকুন এক প্রকার বহিঃপরজীবী। আমাদের দেশে বাছুরসহ অধিকাংশ গবাদিপশু উঁকুন দ্বারা আক্রান্ত হয়ে থাকে। উঁকুন আক্রান্ত বাছুরের শরীরের লোম উস্‌কো খুসকো দেখায় এবং অনেক ক্ষেত্রে লোম ঝরে যায়। শরীরে চুলকানির জন্য বাছুর শরীর ঘষে বলে চামড়ার যথেষ্ট ক্ষতি হয়। উঁকুন আক্রান্ত

বাছুরের স্বাভাবিক বৃদ্ধি হ্রাস পায় এবং রক্তশূন্যতা দেখা দিতে পারে। তাই, উঁকুনের প্রতি উদাসীন না থেকে সময়মত এর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়া ভাল। চকিৎসার জন্য নেগুভন (Neguvon), নাগাসেন্ট (Nagaseent), গ্যামাক্সিন (Gamaxin), এসানটল (Asantol), ইত্যাদি উঁকুন ধ্বংসকারী ঔষধ ব্যবহার করা যেতে পারে।

আঁটালি

আঁটালি এক ধরনের বহিঃপরজীবী। বাছুর কয়েক প্রকার আঁটালি দ্বারা আক্রান্ত হতে পারে। আক্রান্ত বাছুরের গায়ে চুলকানি হয় ফলে বাছুর অস্বাভাবিক আচরণ করে । আঁটালি রক্ত চুষে খায় তাই রক্তশূন্যতা দেখা দেয়, ফলে বাছুরের স্বাস্থ্যের অবনতি ঘটে এবং খুবই দুর্বল হয়ে পড়ে। আক্রান্ত বাছুরের স্বাভাবিক বৃদ্ধি ব্যহত হয়, ফলে বয়সের তুলনায় পশুকে অনেক ছোট দেখায়। আঁটালি বিভিন্ন রোগের জীবাণু বহন করে বলে বাছুর এ সকল রোগ দ্বারা আক্রান্ত হতে পারে এবং আঁটালির আক্রমণ বেশি হলে পশুর পক্ষাঘাতে (Tick paralysis) আক্রান্ত হওয়ার সম্ভবনা থাকে। উঁকুন এবং আঁটালি ধ্বংসের জন্য একই ঔষধ ব্যবহার করা যেতে পারে। কার্যকরভাবে আঁটালি এবং উঁকুন ধ্বংস করার জন্য ৫% ম্যালাথিয়ন বা অন্য কোনো কিটনাশক দ্রবণ আক্রান্ত বাছুরকে গোছল করাতে হবে। মানে রাখতে হবে কার্যকরভাবে আঁটালি ও উঁকুন নিয়ন্ত্রণ করার জন্য খামারের সকল গবাদিপশুকে এক সাথে চিকিৎসা দিতে হবে। একই সাথে খামার পরিষ্কার করে সকল আবর্জনা পুড়িয়ে ফেলে খামারে কিটনাশক প্রয়োগ করতে হবে।

কৃমি

জন্মের পরপরই এমনকি জন্মের আগেও বাছুর মাতৃ গর্ভে কৃমি দ্বারা আক্রান্ত হতে পারে। যে সব কৃমি দ্বারা বাছুর আক্রান্ত হয় তার মধ্যে লম্বা, গোল, কেঁচো বা সূতা কৃমি (Roundworm) চেপ্টা বা পাতা কৃমি (Fluke), ফিতা কৃমি (Tapeworm) উল্লেখযোগ্য। এগুলো আবার বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত। বিভিন্ন প্রকারের কৃমি পশুর পাকস্থলী ও অন্ত্রনালীতে বাস করে, আবার কোনো কোনো কৃমি কলিজা ও ফুসফুসকে আক্রান্ত করে। কৃমি আক্রান্ত পশু মাঠে বা চারণভূমিতে পায়খানা করার ফলে মাঠের ঘাস দূষিত হয়। এসব দূষিত ঘাস সুস্থ গরু খেলে তারাও কৃমিতে আক্রান্ত হয়। তাছাড়া অনেক কৃমি আছে যা শরীরের চর্ম ভেদ করে দেহে প্রবেশ করে। কৃমিতে আক্রান্ত বাছুর সহজে মারা না গেলেও স্বাস্থ্য খারাপ হতে থাকে এবং দৈহিক বৃদ্ধি হ্রাস পায়। আক্রান্ত বাছুরকে ঠিকমত খাবার দিলেও তার স্বাস্থ্যের কোনো উন্নতি হয় না। বরং দিনদিন রোগা হতে থাকে। কারণ কৃমি পশুর খাবারের সারাংশে ভাগ বসায় এবং শরীরের বিভিন্ন অঙ্গের ক্ষতি সাধন করে। আক্রান্ত বাছুরের শরীরের লোম উসকোখুসকো দেখায়, বাছুর দুর্বল হয়ে পড়ে এবং দৈহিক বৃদ্ধি ও খাওয়া-দাওয়া কমে যায়। পশু ক্রমান্বয়ে হাড্ডিসার হয়ে পড়ে এবং রক্ত শূন্যতা দেখা দেয়। কখনো পাতলা পায়খানা আবার কখনো কোষ্ঠ্যকাঠিন্য দেখা দেয়। আক্রান্ত বাছুরের শরীরে বিশেষত চোয়ালের নিচে পানি জমতে থাকে। গোল কৃমির জন্য নেমাফেক্স (Nemafex), ট্রোডেক্স (Trodex), রালনেক্স (Ralnex), নেলভার্ম (Nelverm); পাতাকৃমির জন্য বিলিভন (Bilivon), ফেসিনেক্স (Fesinex), জেনিল (Zenil); ফিতাকৃমির জন্য প্রিপিসাইড (Pripicide), ইউভিলন (Uvilon), ম্যানসলিন (Mansolin) ইত্যাদি ঔষধ প্রয়োগ করলে ভাল ফল পাওয়া যায়। আমাদের দেশে গবাদি পশুর লালন-পালন ব্যবস্থায় বছরে ২ বার ক্রিমির ঔষধ খাওয়ানো ভাল।

সংক্রামক ও ছোঁয়াচে রোগ

সংক্রামক ও ছোঁয়াচে রোগসমূহ সাধারণত বিভিন্ন ধরনের ব্যাকটেরিয়া ,ভাইরাস, ফাংগাস ও প্রোটোজোয়া দ্বারা সংঘটিত হয়। রোগের উৎপত্তির কারণ, উপসর্গ, চিকিৎসা ও প্রতিকারের ব্যবস্থা জানা থাকলে ব্যাপক মৃত্যুর হাত থেকে বাছুর সম্পদকে রক্ষা করা সহজ হতে পারে।

বাছুরের সাদা উদরাময় (Calfscour/colibacillosis)

সাধারণত ২ সপ্তাহের নিচের বয়সের বাছুরে এ রোগ দেখা যায়। কাফস্কাওয়ার হলে বাঁছুর পাতলা সাদা পায়খানা করে, এটি বাছুরের একটি মারাত্মক ব্যাধি। খারাপ ব্যবস্থাপনা ও কৃত্রিম উপায়ে বাছুরকে ঠিকমত না খাওয়ানোর কারণে এ রোগ হতে পারে। তাছাড়া শালদুধের অভাব, এক সময়ে বা অনিয়মিতভাবে অত্যধিক পরিমাণে দুধ খাওয়ানো, অথবা অত্যধিক ঠান্ডা দুধ খাওয়ানো এবং বাছুরের মায়ের রসদে সবুজ খাদ্যের স্বল্পতার কারণে এ অবস্থা হতে পারে। এ রোগের কারণ এসকারেসিয়া কলাই (E. coli) নামক জীবাণু যা সাধারণত মানুষ অথবা পশুর অন্ত্রে বাস করে।

লক্ষণ

১. বাছুর ঘন ঘন মল ত্যাগ করে,

২. চাল ধোয়া পানির মত সাদা রং এর পচা দুর্গন্ধযুক্ত পাতলা পায়খানা হয়,

৩. অনেক সময় মলে রক্ত দেখা যায় এবং মলদ্বারের চারদিকে পাতলা মল লেগে থাকে,

৪. প্রথম দিকে জ্বর হয় এবং অল্প সময়ের মধ্যে তাপমাত্রা স্বাভাবিকের নিচে নেমে যায়,

৫. খাওয়ায় অরুচি পরিলক্ষিত হয়,

৬. বাছুর আস্তে আস্তে দুর্বল ও নিস্তেজ হয়ে পড়ে এবং অবশেষে মারা যায়।

চিকিৎসা ও প্রতিকার

লক্ষণ দেখা দেয়ার সাথে সাথে চব্বিশ ঘন্টার জন্য দুধ খাওয়ানো বন্ধ রাখতে হবে। এরপর গম অথবা ভুট্টার কুঁড়া অথবা উষ্ণ পানি দিতে হবে এবং সাথে সাথে দুধ খাওয়ানোর পরিমাণ বাড়াতে হবে। প্রতিদিন আধা লিটার পর্যন্ত কলস্ট্রাম যোগাড় করে খাওয়াতে হবে। শরীরে পানি শূন্যতা দেখা দিলে পশুকে খাওয়ার স্যালাইন খাওয়াতে হবে এবং চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী সালফার জাতীয় ট্যাবলেট বা ক্যাপসুল বা ইনজেকশন দিতে হবে। এই রোগের প্রতিকার হিসেবে জন্মের পর বাছুরকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ও রোগমুক্ত জায়গায় রাখতে হবে এবং পরিমিতভাবে শালদুধ খাওয়াতে হবে।

নিউমোনিয়া (Pneumonia)

ভাইরাস, ব্যাকটেরিয়া, ফাংগাস, রাসায়নিক দ্রব্যাদি ইত্যাদি কারণে বাছুরের নিউমোনিয়া হতে পারে। এই রোগে শ্বাস-প্রশ্বাসের মাত্রা বেড়ে যায়। কাশি হয়, শ্বাস-প্রশ্বাসে অস্বাভাবিক ভাবে শব্দ হতে পারে। রোগের কারণ ও অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে লক্ষণের তারতম্য হয়ে থাকে। নিউমোনিয়ার প্রচলিত নাম শ্বাস রোগ, পাঁজর ব্যথা।

লক্ষণ

১. ঘন ঘন নিঃশ্বাস এই রোগের প্রধান ও প্রথম লক্ষণ,

২. রোগের শেষ পর্যায়ে শ্বাস কষ্ট হয় এবং ইন্টারস্টিশিয়াল (Interstitial) নিউমোনিয়াতে শুষ্ক কাশি হয়,

৩. তীব্র রোগে জ্বর হয় এবং নাক দিয়ে সর্দি পড়ে, এবং

৪. বুকের মধ্যে গড় গড় শব্দ হয়।

চিকিৎসা

পশু চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী প্রয়োজনীয় এন্টিবায়োটিক ইনজেকশন বাছুরের শিরায় অথবা মাংসপেশিতে দিতে হবে এবং সেই সাথে এন্টিহিস্টামিনিক ইনজেকশন নির্ধারিত মাত্রায় ব্যবহার করতে হবে।

সাবধানতা

শিরায় ইনজেকশনের ক্ষেত্রে ঔষধ ধীরে ধীরে প্রয়োগ করতে হবে। মাংসপেশিতে ও চামড়ার নিচে ইনজেকশনের ক্ষেত্রে এক জায়গায় ১০ মিলি এর বেশি প্রয়োগ করা উচিত নয়।

বাছুরের ডিপথেরিয়া (Calf diphtheria)

ডিপথেরিয়া একটি মারাত্মক সংক্রামক ব্যাধি। এই রোগ দুই ভাবে হতে পারে। যেমন-

(ক) বাছুরের ল্যারিংস (Larynx) আক্রান্ত হলে,

(খ) মুখ গহ্বর (Oral cavity) আক্রান্ত হলে।

সাধারণত ৩ মাসের কম বয়সের বাছুরের মুখগহবরে সংক্রমণের ফলে ডিপথেরিয়া হয়। অপরদিকে ল্যারিংসে সংক্রমণের ফলে যে ডিপথেরিয়া হয় তা সাধারণত বেশি বয়সের বাছুরেই হয়। স্ফেরোফোরাস নেক্রোফোরাস (Spherophorus necrophorus) নামক ব্যাকটেরিয়া এই রোগের কারণ।

লক্ষণ

মুখগহবর সংক্রমিত হলে-

১. জ্বর হয়,

২. মুখ দিয়ে লালা পড়ে,

৩. বাছুর দুধ খেতে পারে না,

৪. ল্যারিংস সংক্রমিত হলে মুখ দিয়ে গোংগানির মত ঘড় ঘড় শব্দ হয়,

৫. রোগের শেষ পর্যায়ে নাক দিয়ে পানি পড়ে এবং পশু জিহ্বা বের করে রাখে এবং

৬. শ্বাস-প্রশ্বাস দ্রুত হয় এবং মুখ দিয়ে লালা পড়ে ।

চিকিৎসা ও প্রতিকার

রোগ বিস্তার রোধকল্পে শক্ত (Coarse) খাবার দেয়া থেকে বিরত থাকতে হবে। পশু চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী সালফানিলামাইড এবং এন্টিবায়োটিক দ্বারা কার্যকর চিকিৎসা করা যেতে পারে ।

ক্ষুরা রোগ (Foot and Mouth Disease)

ক্ষুরা রোগ ভাইরাস দ্বারা সংক্রমিত একটি মারাত্মক ছোঁয়াচে রোগ যার ফলে মুখে ও পায়ে এক সাথে ঘা বা ক্ষতের সৃষ্টি হয় । এ দেশে চার ধরনের ভাইরাস (A, O, C, Asia-1) দ্বারা এরোগের সৃষ্টি হয় । এলাকাভেদে ক্ষুরা রোগের প্রচলিত নাম জ্বরা,পাতা, তাপা, ক্ষুরাপাকা, ইত্যাদি । দূষিত খাদ্য, পানি, বাতাস বা আক্রান্ত পশুর সংস্পর্শের মাধ্যমে সুস্থ দেহে এ রোগ সংক্রমিত হয় ।

লক্ষণ

১. প্রাথমিক অবস্থায় জ্বর দেখা দেয় এবং শরীরের তাপমাত্রা ১০১°-১০৫° ফা. পর্যন্ত হতে পারে,

২. মুখ দিয়ে বিরামহীন লালা পড়ে, সময় সময় মুখে চপ চপ শব্দ হয় ।

৩. জিহ্বা ও মুখের ভেতরে এবং পায়ের ক্ষুরার মাঝখানে ফোসকা পড়ে এবং ফেটে গিয়ে ঘা বা ক্ষতের সৃষ্টি হয়,

৪. পায়ের ঘা বা ক্ষতে মাছি ডিম পাড়ে এবং মাছির লার্ভা বা শুককীট ঘা বা ক্ষতে অধিকতর জটিলতার সৃষ্টি করে,

৫. এ রোগে বাছুর মারাত্মকভাবে আক্রান্ত হয় এবং বেশির ভাগ ক্ষেত্রে মারা যায় ।

চিকিৎসা

১. ফিটকারির গুঁড়া পানিতে মিশিয়ে ভাল করে মুখ ও পায়ের ঘা ধুয়ে দিতে হবে,

২. ট্রাইসালফার ১টি বড়ি ৩৫ কেজি ওজন মাত্রায় দিনে একবার খাওয়াতে হবে এবং পরদিন হতে অর্ধেক মাত্রায় পর পর ৩দিন খাওয়াতে হবে,

৩. আক্রান্ত বাছুরকে নরম খাবার দিতে হবে,

৪. চিকিৎসার ব্যাপারে পশু চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে ।

রোগ প্রতিরোধ

সুস্থ বাছুরকে সময়মত টিকা দিলে এ রোগ হয় না । বাংলাদেশে ক্ষুরারোগের প্রতিষেধক টিকায় মোট ৩টি ভাইরাস স্ট্রেইন (A, O, Asia-1) ব্যবহার করা হয় ।

ভাইরাস স্ট্রেইন এর উপর ভিত্তি করে ক্ষুরারোগের ২ ধরনের টিকা প্রস্তুত হয় । যথা ঃ

(ক)	মনোভ্যালেন্ট টিকা	ঃ	যে কোনো একটি স্ট্রেইন দ্বারা প্রস্তুত টিকা ।
	প্রয়োগ মাত্রা	ঃ	বাছুরের জন্য ৩ মিলি ।
(খ)	বাইভ্যালেন্ট টিকা	ঃ	যে কোনো ২টি স্ট্রেইন দ্বারা প্রস্তুত টিকা ।
	প্রয়োগ মাত্রা	ঃ	বাছুরের জন্য ৬ মিলি ।

টিকার প্রয়োগ বিধি

উপরোক্ত টিকাগুলো পশুর গলকম্বলের চামড়ার নিচে প্রতি ৪-৫ মাস অন্তর অন্তর দিতে হবে ।

সতর্কতা

৪ মাসের কম বয়সী বাছুরে টিকা দেয়া হয় না ।

টিকা সংরক্ষণ

রেফ্রিজারেটরে ২°-৮° সে. তাপমাত্রায় সংরক্ষণ করা যায় ।

বাদলা (Black leg বা Black quarter)

অল্প বয়স্ক পশু অর্থাৎ ৬ মাস থেকে ২ বছরের গবাদিপশু এই রোগে বেশি আক্রান্ত হয়ে থাকে । বাদলা একটি মারাত্মক সংক্রামক ব্যাধি যাতে মাংসের প্রদাহ ও রক্ত দুষ্টতা হয়ে থাকে । ক্লাস্ট্রিডিয়াম সোভিয়াই (Clostridium Chauvoei) নামক ব্যাকটেরিয়া এই রোগের কারণ । দূষিত খাদ্য ও পানির মাধ্যমে সুস্থ বাছুরের দেহে এ রোগ সংক্রমিত হয় ।

লক্ষণ

১. তীব্র জ্বর অনুভূত হবে (১০৫°-১০৭° ফা.)

২. যে কোন ১ টি বা ২টি পায়ের (সম্মুখের বা পেছনের) উপরিভাগে মাংসবহুল জায়গা ফুলে ওঠে ।

৩. ফুলাভাব পরে অন্যান্য দিকেও বিস্তার ঘটে । ফুলা স্থান প্রথমে গরম ও বেদনাদায়ক থাকে । পরে ঠান্ডা ও ব্যাথাহীন হয়ে পড়ে । ফুলা জায়গায় চাপ দিলে পচ পচ বা ফড়ফড় শব্দ করে যা এটাই এ রোগের প্রধান বৈশিষ্ট্য ।

৪. কোষ্ঠ্যকাঠিন্য দেখা দেয় ।

৫. পশু খুঁড়িয়ে হাঁটে ।

৬. আস্তে আস্তে দুর্বল হয়ে পড়ে এবং অবশেষে মারা যায় ।

চিকিৎসা

যথাসময়ে সালফার ড্রাগ বা উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন এন্টিবায়োটিক শিরায় প্রয়োগ করলে আক্রান্ত পশুটি

ভাল হতে পারে। ফুলা স্থানে গরম ছেক এবং অভিজ্ঞ চিকিৎসকের দ্বারা কেটে দিলে রোগের প্রখরতা কমার সম্ভবনা থাকে।

প্রতিরোধ

সুস্থ অবস্থায় সময়মত প্রতিষেধক টিকা দেয়া দরকার।

টিকার প্রয়োগ মাত্রা

তিন মাস থেকে ৩ বছর বয়সী বাছুরকে ৫ মিলি টিকা কাঁধ বা ঘাড়ের চামড়ার নিচে প্রয়োগ করতে হয়। টিকা প্রয়োগের পর স্থানটি উত্তমরূপে মালিশ করা প্রয়োজন। ছয় মাস পর পর এই টিকা প্রয়োগ করতে হয়।

সতর্কতা

টিকার বোতল খোলার পর ২৪ ঘন্টা অতিক্রান্ত হলে এই টিকা ব্যবহার করা যাবে না।

টিকা সংরক্ষণ

রেফ্রিজারেটরে ৪°-৮° সে. তাপমাত্রায় রাখতে হবে।

গলাফুলা (Haemorrhagic septicaemia)

গলাফুলা একটি ছোঁয়াচে এবং সংক্রামক ব্যাধি। সাধারণত অতি তীব্র ও তীব্র এই দুই পর্যায়ে এ রোগ পরিলক্ষিত হয়। পাস্টুরেলা মালটোসিডা (Pasteurella multocida) এবং পাস্টুরেলা হিমোলাইটিকা (Pasteurella haemolytica) ব্যাকটেরিয়া এই রোগের প্রধান কারণ। আমাদের দেশে সাধারণত বর্ষার শুরুতে ও বর্ষার শেষে এই রোগের প্রাদুর্ভাব দেখা যায়। এলাকাভেদে গলাফুলা রোগের প্রচলিত নাম ব্যাঙগা, ঘটু, গলঘটু, গলবেরা, ইত্যাদি। দূষিত খাদ্য ও পানির মাধ্যমে সুস্থ দেহে রোগের জীবাণু প্রবেশ করে।

লক্ষণ

অতি তীব্র রোগে কোনো লক্ষণ ছাড়াই পশু হঠাৎ মারা যায়। তীব্র রোগে নিচের লক্ষণগুলো দেখা যায়ঃ

১. দৈহিক তাপমাত্রা অত্যধিক বৃদ্ধি পায় (১০৫°-১০৭° ফা.),

২. গলা ফুলে যায় এবং ফুলা জায়গায় হাত দিলে গরম অনুভূত হয়। ফুলা ক্রমশ গলা থেকে বুক পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ে,

৩. শ্বাস-প্রশ্বাসে কষ্ট হয় এবং শ্বাস ত্যাগের সময় আওয়াজ হয়,

৪. জিহ্বা ফুলে যায় এবং সময় সময় মুখ হা করে ও জিহ্বা বের করে শ্বাস-প্রশ্বাস গ্রহণ করে,

৫. অনেক সময় কাশি হয়,

৬. চোখে পিঁচুটি দেখা যায়,

৭. নাক দিয়ে ঘন সাদা শ্লেষ্মা পড়তে দেখা যায়,

৮. পানাহার বন্ধ করে দেয়,

৯. পশু ধীরে ধীরে দুর্বল হয়ে পড়ে এবং সময়মত উপযুক্ত চিকিৎসার অভাবে মারা যায়।

চিকিৎসা

Oxytetracyclin (long acting) 1ml/10kg body weight i/m injection এবং ৭২ ঘন্টা পর আরেকটি ইনজেকশন সমমাত্রায় মাংসে প্রয়োগ করতে হবে।

প্রতিষেধক

সুস্থ অবস্থায় সময় মত প্রতিষেধক টিকা দেয়া উচিত।

প্রয়োগমাত্রা

পশুর গলার পার্শ্বে ঢিলা চামড়ার নিচে ১ মিলি টিকা এক বছর পর পর দিতে হয়।

সতর্কতা

কেবলমাত্র সুস্থ সবল পশুতে এই টিকা দেয়া উচিত। টিকা প্রয়োগের স্থান কয়েক দিন ফুলা থাকতে পারে এবং দেহের তাপমাত্রা সামান্য বৃদ্ধি পেতে পারে।

টিকা সংরক্ষণ

রেফ্রিজারেটরে ৪° সে. তাপমাত্রায় সংরক্ষণ করতে হবে।

তড়কা (Anthrax)

তড়কা একটি অতি তীব্র (Peracute) বা তীব্র (Acute) সংক্রামক রোগ। এ রোগে আক্রান্ত পশু হঠাৎ মারা যায়। মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্তে বা পরে নাক, মুখ, মলদ্বার ইত্যাদি দিয়ে তরল আলকাতরা রং-এর রক্ত মিশ্রিত রস নির্গত হতে থাকে। ব্যাসিলাস অ্যানথ্রাসিস (Bacillus anthrasis) নামক ব্যাকটিরিয়া এই রোগের কারণ। দূষিত খাদ্য ও পানির মাধ্যমে এ রোগ পশুতে বিস্তার লাভ করে।

লক্ষণ

অতি তীব্র রোগে আক্রান্ত পশু আকস্মিকভাবে মারা যায় এবং অনেক সময় লক্ষণ দেখা যায় না।

তীব্র রোগে নিম্ন লিখিত লক্ষণগুলো প্রকাশ পায়

- প্রথমে অত্যধিক জ্বর (১০৫°-১০৭°) হয়,
- শরীরে লোম দাঁড়িয়ে যায়,
- শরীর কাঁপতে থাকে,

- শ্বাস-প্রশ্বাস দ্রুত ও গভীর হয়,
- পশু মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে থাকে, কিংবা পশুকে কিছুটা উত্তেজিত দেখা যায়,
- এক সময় পশু নিস্তেজ হয়ে পড়ে, খিঁচুনি হয় এবং মারা যায় ।

চিকিৎসা

সময়মত পশু চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন এন্টিবায়োটিক ইনজেকশন ব্যবহার করলে ভাল ফল পাওয়া যেতে পারে ।

প্রতিষেধক

সুস্থ পশুকে যথাসময়ে টিকা দেয়া দরকার ।

টিকার প্রয়োগ মাত্রা

বাছুরের গলার চামড়ার নিচে ০.৫ মিলি টিকা প্রয়োগ করতে হয় । এই টিকা এক বছর পর পর দিতে হয় ।

সতর্কতা

এই টিকা কেবল সুস্থ পশুকে দেয়া উচিত । টিকা প্রদানের স্থান কয়েক দিনের জন্য ফুলা থাকতে পারে এবং শরীরের তাপমাত্রা সামান্য বৃদ্ধি পেতে পারে ।

টিকা সংরক্ষণ

টিকার বোতল রেফ্রিজারেটরে ৪°-৫° সে. তাপমাত্রায় রাখতে হবে ।

বাছুরের স্বাস্থ্য বিধি পালন

ইংরেজিতে একটি প্রবাদ আছে Prevention is better than cure অর্থাৎ রোগের চিকিৎসার চেয়ে রোগ যাতে না হয় সে ব্যবস্থা গ্রহণ করাই বুদ্ধিমানের কাজ । বাছুরের স্বাস্থ্য রক্ষা ও রোগমুক্ত রাখার জন্য বিশেষ কয়েকটি নিয়মের প্রতি খেয়াল রাখলে ভবিষ্যতে অসুখ-বিসুখ হওয়ার সম্ভাবনা কম থাকে ।

১. জন্মের পরপরই বাছুরকে মায়ের শালদুধ (Clostrum) খাওয়াতে হবে । যেহেতু কলস্ট্রাম অধিক পরিমাণে 'এন্টিবডি' দ্বারা গঠিত সেহেতু নবজাত বাছুরের জন্য ইহা অত্যন্ত প্রয়োজনীয় । এই শালদুধ খাওয়ালে বাছুরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি পায় ।

২. স্বাস্থ্যসম্মত বাসস্থান, পরিষ্কার সুষম খাদ্য, পরিষ্কার পানি, সেবা-যত্ন ইত্যাদির প্রতি লক্ষ্য রাখা দরকার ।

৩. বাছুরগুলোকে পৃথক পৃথক রাখা উচিত । সুস্থ বাছুরকে কোনো অবস্থাতেই রোগাক্রান্ত পশুর সংস্পর্শে যেতে দেয়া যাবে না । এতে রোগ সংক্রমণের ভয় থাকে ।

৪. বাছুরের শরীর নিয়মিত পরিষ্কার করা উচিত। শুকনো খড় দ্বারা তাদের শরীর ঘষে পরিষ্কার করে গোসল করানো প্রয়োজন।

৫. খাবার পাত্র ও পানির পাত্র নিয়মিত পরিষ্কার করা উচিত।

৬. কুকুর, বিড়াল, উঁকুন, আঁটালি, মশামাছি, পোকা-মাকড় এ সবের যেন উপদ্রব না থাকে তা খেয়াল রাখা উচিত।

৭. কোনো রোগের লক্ষণ প্রকাশ পাওয়া বা অসুস্থতা দেখা দেয়ার সাথে সাথে সেটাকে আলাদা করে ত্বরিত চিকিৎসা ব্যবস্থা ও পরিচর্যা করা উচিত।

৮. রোগে কোনো বাছুর মারা গেলে, তা মাটিতে পুঁতে রাখা বা পুড়ে ফেলা উচিত।

৯. বছরে দুবার অর্থাৎ বর্ষার প্রারম্ভে ও শরতের শেষে নির্দিষ্ট মাত্রায় কৃমিনাশক ঔষধ ব্যবহার করলে বাছুরের দৈহিক বৃদ্ধি ভাল হয়।

১০. যে সব রোগের প্রতিষেধক টিকা আছে, সময়মত স্থানীয় চিকিৎসকের সাথে যোগাযোগের মাধ্যমে সে সকল রোগের প্রতিষেধক টিকা দেয়া দরকার।

উপসংহার

সর্বোপরি উপরিল্লেখিত ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে বাছুরকে লালন-পালন করলে সুস্থ সবল বাছুর পাওয়া সম্ভব এবং এর মাধ্যমে আমাদের দেশের পশুসম্পদের সার্বিক উন্নয়ন সম্ভব।

প্যাকেজের উদ্ভাবকঃ ড. শরীফ আহম্মদ চৌধুরী, ড. এম, জে, এফ, এ, তৈমুর ও ডা. মোঃ গিয়াসউদ্দিন